কপোতাক্ষ নদের কান্না
এইচ এম আবদুর রহিম ১৮ জুন ২০২২, ০০:০০

আজ কপোতাক্ষ পাড়ে যে লাখ লাখ বিঘা জমি জেগে উঠেছে তা যদি প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হতো তাহলে সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর জেলার প্রায় ৫০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা করা যেত। সরকারি বিধিতে আছে ভূমিহীন পবিরারের লোকেরা তিন বিঘা করে খাসজমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিতে পারবে। কিন্তু প্রকৃত ভূমিহীনরা কিন্তু এ জমি মূলত পায় না।

কারণ, তিন বিঘা জমি বন্দোবস্ত নিতে হলে প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ হয় যার সঙ্গতি অনেকের নেই। একটি ভূমিহীন পরিবার তিন বিঘা জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিতে নির্ভেজাল খাসজমি থাকতে হয়। প্রথমে জমিটি শনাক্ত করে স্কেচ ম্যাপ তৈরি করা লাগে। ম্যাপে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সুপারিশ থাকে। এরপর প্রস্তাবিত জমির অনুকূলে স্থানীয় তহশিলদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন এসিল্যান্ড বরাবর পাঠাতে হয়। উপজেলা ভূমিহীন কমিটির মিটিংয়ে এটি আবার পাস করা লাগে। এরপর এ প্রতিবেদন এডিসি বরাবর পাঠাতে হয়। সমুদয় কাগজপত্র পর্যালোচনা করে এডিসি কবুলিয়ত সম্পাদনের জন্য সুপারিশ করেন। অবশেষে রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে কবুলিয়াত সম্পাদন করা হয়। এতগুলো কার্য সম্পাদন করতে কত টাকা খরচ হয় একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারে না। জমিজমা সংক্রান্ত ফাইল কোনো টেবিলে গেলে মোটা অঙ্কের টাকা লুফে নেয়া হয়। কারণ জমির মূল্য অনেক। কাজেই টাকা ছাড়া ফাইল চলে না। প্রকৃত ভূমিহীনদের এ অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য তো নেই। কাজেই এক শ্রেণীর ধূর্ত লোক মূলত বিভিন্ন কায়দায় কাগজপত্র তৈরি করে এসব জমি ভোগদখল করে। ভূমিহীনরা মূলত ভূমিহীন থেকে যায়।

এ দিকে কপোতাক্ষ নদের মতো করুণ অবস্থা বিরাজ করছে অন্যান্য নদীতেও। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, মহানন্দা ও গড়াই নদের পানি ভারত উজানে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে গঙ্গানদীতে ফারাক্কা বাঁধ, তিস্তার গজলডোবা বাঁধ, মনু নদীতে নলকাঁথা বাঁধ, খোয়াই নদীর ওপর চাকমা ঘাট বাঁধ, বাংলা বন্ধে মহানন্দা নদীর ওপর বাঁধ, গোমতি নদীর ওপর মহারানী বাঁধ এবং মুহুরি নদীর ওপর কসসি বাঁধ নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে পানির নায্যহিস্যা থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছে বছরের পর বছর। এ ছাড়া ১৫টি নদীর ওপর ভারত কাঁচা বাঁধ নির্মাণ করেছে। বর্ষার সময়ে এসব অস্থায়ী বাঁধ কেটে দেয়া হয়। ভারতের এই পানি আগ্রাসীর কবলে পড়ে শুষ্ক মৌসুমে দেশের নদ-নদীগুলো পানিশূন্য হয়ে পড়ে। আর বাংলাদেশকে ভাসানো হয় পানি দিয়ে। এ ছাড়া সীমান্ত নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে ভারত পরিকল্পিতভাবে স্থাপনা তৈরি করে বাংলাদেশ অংশে ভাঙনের সৃষ্টি করেছে। ভারতের কবলে পড়ে শত শত কোটি টাকা নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী সীমান্ত নদীর ভাঙনে পড়ে ওপারে জেগে উঠে ভূমি আর ভারত; কখন ফেরত পাবে না বাংলাদেশ। এভাবে বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশ ৫০ হাজার বিঘা জমি হারিয়েছে। কিন্তু দেশের মূল্যবান জমি ফেরত আনার উদ্যোগ নিতে ভারত আপত্তি জানায়। এসব জানার পরও সীমান্ত ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। জানা যায়, সীমান্তে ওই এলাকা থেকে বালু কেটে নিয়ে যাওয়ায় সুরমা, কুশিয়ারা, মনু, খোয়াই, ধরলা, দুধকুমার, মাতামুহুরি, আত্রাই, তিস্তা, পদ্মা, গঙ্গা, ইছামতি নদীতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার প্রশাসনিক এলাকায় বঙ্গোপসাগরে দক্ষিণ তালপট্টি নামে যে ভুখণ্ডটি জেগে উঠেছে সেটি রোয়েদাদ অনুযায়ী বাংলাদেশের অংশ হলেও সামরিক শক্তির জোরে ভারত অপদখল করে রেখেছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দক্ষিণ তালপট্টি নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের অংশ বা ভূখণ্ড। মরহুম জিয়াউর রহমানের আমলে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের দক্ষিণ তালপট্টির ওপর সার্বভৌম দাবি করা হয়। আন্তর্জাতিক আদালতে সঠিকভাবে বাংলাদেশের দাবি উত্থাপন করতে না পারায় তালপট্টি দ্বীপ এখন 'ভারতের' হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দক্ষিণ তালপট্টিকে 'নিউ মুর দ্বীপ'এবং পূর্বাশা নামে অভিহিত করে তাদের বলে দাবি করে আসছিল।

১৯৮১ সালে ভারত সেখানে সর্বপ্রথম পতাকা উড়ায় এবং একটি অস্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প স্থাপন করে। এই অগভীর স্থানে ২৫ থেকে ৩০ বর্গমাইলবিশিষ্ট ভূমি জেগে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ তালপট্টি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র বাংলাদেশের অংশ হলেও বিপুলাকার ভারত মানতে রাজি নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে আমাদের ভূমিসহ অন্যান্য সম্পদের ওপর ভারতের আগ্রাসী তৎপরতার অবসান ঘটেনি। একই চিত্র আমরা বঙ্গোসাগরের সমুদ্রসীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশেও আমাদের নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারত বন্ধুসুলভ সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রদর্শনের পরিবর্তে তাদের আধিপত্য চেহারাটাকেই স্বাধীনতা উত্তর ৫০ বছর ধরে দেখিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ছোট-বড় ৫৪টি নদীর অধিক আন্তর্জাতিক নদীর উজানে রয়েছে ভারত। অভিন্ন নদীর পানি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষোভ বহু পুরনো। এটি বেশি উচ্চারিত হয় গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ফারাক্কা ব্যারাজকে ঘিরে। শুকনা মৌসুমে এই ব্যারাজ দিয়ে পানি আটকে দেয় ভারত। বর্ষা মৌসুমে সব ব্যারাজের সব ফটক খুলে পানি ছেড়ে দেয় বাংলাদেশের দিকে। গত বছর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বহু মানুষ লিখেছেন, 'এবার বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য ভারত দায়ী।' বাংলাদেশের পানি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ জন্য অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত দায়ী। কেউ কেউ আবার এমনো বলেছেন, 'বৃষ্টির পানি ফারাক্কা ব্যারাজ দিয়ে আটকে ভারত কেন নিজের ক্ষতি করবে?' সাদা চোখে দেখলে দুটো বক্তব্যই সত্যি। শুকনা মৌসুমে ফারাক্কা ব্যারাজের মাধ্যমে যেভাবে পানি আটকে রাখা হয় তা বর্ষা মৌসুমে করা হলে বাংলাদেশে এতটা বন্যা হতো না। কিন্তু গঙ্গা চুক্তিতে এমন বিধান তো আসলে নেই। চুক্তিতে শুকনা মৌসুমে অল্প পানি 'ন্যায়সঙ্গতভাবে'ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা বাংলাদেশ-ভারত করেছে। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে বেশি পানির বোঝা দুই দেশ ন্যায়সঙ্গতভাবে বহন করবে, এমন কোনো বিধান গঙ্গা চুক্তিতে নেই। সমস্যাটা রয়েছে বাংলাদেশ-ভারতের চুক্তিগুলোতে। প্রকৃতিকে নিজের মতো চলতে দিলে বন্যার ক্ষতির চেয়ে লাভ হয়তো বেশি হতো বাংলাদেশের। ভারত-বাংলাদেশের গঙ্গা চুক্তিগুলোর আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে, চুক্তির ধারাগুলো অববাহিকাভিত্তিক নয়। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে নদীকে যৌথ সম্পদ বিবেচনা করে অববাহিকার সব রাষ্ট্র মিলে সমন্বিতভাবে এর উন্নয়ন, ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা করে থাকে। লক্ষ্য থাকে যেকোনো দেশকে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, নদীর পানির টেকসই ব্যবহার করা এবং নদীটির প্রতিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা।
ভারত-বাংলাদেশের ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে এর বহু কিছু করা হয়নি। এতে নেপালকে রাখা হয়নি। এমনকি উত্তর প্রদেশ বিহারে গঙ্গার পানি ব্যবহারকে সমন্বিত করা হয়নি। এসব রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আগেই পানি একতরফা ব্যবহারের পর

লেজের অংশে থাকা অবশিষ্ট পানি ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পানি বাংলাদেশের চাহিদার তুলনায় নিদারুণভাবে কম। শুষ্ক মৌসুমে কম পানি পাওয়ার কারণে জিকে প্রকল্পসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সেচকাজ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রাণিবৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মারাত্মকভাবে। এ ছাড়া নিম্ন অববাহিকায় সমুদ্রের লোনা পানি আরো ভেতরে ঢুকে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ চিন্তা করছে এই ক্ষতি এড়াতে বাংলাদেশ একটি গঙ্গা ব্যারাজ নির্মাণ করবে কি না। তারা এসব বিষয়ে জানেন, কিভাবে নানা অজুহাতে তিস্তাসহ আটটি অভিন্ন নদীর পানি ভাগাভাগি ৩৪ বছর ধরে ভারত ঝুলিয়ে রেখেছে। এই ইতিহাস যাদের মনে আছে তাদের প্রশ্ন আসে স্বাভাবিকভাবে। এই বন্যার জন্য ভারতকে দায়ী করলে অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে। অভিন্ন নদীর পানি নিয়ে বাংলাদেশের বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন অতিশয়োক্তি করার মনোভাব দেশের মানুষের থাকতে পারে। কারণ নদীর পানি বাড়লে কমলে প্রভাবিত হয় তার জীবন। এর আঁচ দেশের শাসকদের গায়ে লাগে না। সম্ভবত অন্তরেও লাগে না আর। বাংলাদেশের মানুষ ভারতের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আরো অভিযোগ করবে। তার মধ্যে কখনো কখনো অতিরঞ্জন থাকবে। কিন্তু এটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক নিয়ে সরকারের অতিরঞ্জনের স্বাভাবিক প্রতিবয়ান। এর জন্য মানুষ দায়ী নয়, দায়ী ভারত-বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট